Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 01–08
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

প্রেম ও প্রতিবাদের আলোকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা : একটি পর্যালোচনা

সৌমিত্র বাগ
ই-মেইল: soumitrbag413@gmail.com

Keyword
নারীর অবস্থান, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য, রাধার প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ, অনিচ্ছা, প্রেম, প্রতিবাদ

Abstract
নরনারী একে অপরের পরিপূরক হলেও মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় নারী এই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অবস্থান করেনি। তারা ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। পরপুরুষ দর্শনের আশঙ্কায় পুরুষেরা তাদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া তাদের অন্য কোনো মূল্য ছিল না। নারীর এই পরিণতি সভ্যতার সবস্তরেই দেখা যায়নি। যখন সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক তখন নারীরা ছিল প্রকৃতিস্বরূপা। প্রকৃতি সত্তার সঙ্গে নারী সত্তাকে এক করে দেখা হত। বৈদিক যুগেও নারীরা ছিল চিন্তাশক্তির যথেষ্ট অধিকারিণী। একাধিক পতি গ্রহণে তাদের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু যখন থেকে নারীকে পরিকল্পিতভাবে গৃহকোণে আবদ্ধ করা হল তখন থেকেই শুরু হয়েছে পুরুষের আধিপত্য, সাথে বহুগামিতা। সমাজে নারীর এই শোচনীয় অবনতির চিহ্ন ধারণ করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পথচলা। অবস্থা যতই করুণ হোক, ভেতরে ভেতরে নারীর ক্ষোভও ছিল। সাথে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সাথে মিলনের চাহিদাও তৈরি হচ্ছিল। কখনও কখনও চকিতে সেই ক্ষোভের প্রকাশ দেখি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মধ্যে এই সত্তার বিচ্ছুরণ ঘটেছে। রাধা প্রথমে কৃষ্ণের প্রস্তাব নাকচ করে প্রতিবাদ করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণের কাছে দেহদান করেছে ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রেমিকা সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে। এই প্রেমিকা সত্তার আশ্রয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হয়েছে।

Discussion

১

সৃষ্টির নিয়মে নারী ও পুরুষ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। চাঁদের যেমন জ্যোৎস্না আছে, সমুদ্রের আছে ঢেউ, তেমনি নরনারী একে অপরের পরিপূরক। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় নর-নারীর সম্পর্ক একই জায়গায় অবস্থান করেনি অথচ আদিম সমাজের বন্ধনহীন বহুগামিতা থেকে যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠল তখন নারী পাদপ্রদীপের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল। এবং মানব সংস্কৃতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে নারীর মিল দেখে। প্রকৃতির উৎপাদনশীলতা ও নারীর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাকে মানুষ একই শক্তির ভিন্ন প্রকাশ

হিসেবে দেখেছিল। সন্তান ও খাদ্য একইসঙ্গে যে দিতে পারে সে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি। নারী হয়ে উঠলো প্রকৃতি স্বরূপা।

> "পৌরুষ যা ছিল শৌর্যে-বীর্যে দ্যুতিময় প্রভাত সূর্যের স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বলতায় নারীত্বের মহিমান্বিত পাদপীঠে গেয়ে উঠলো বন্দনা গান। পুরুষপ্রাধান্যকে পিছনে ফেলে মাতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সূচনাপর্ব শুরু হল।" [১]

সভ্যতার পরবর্তী স্তরে মানুষ যখন কৃষিকাজে উন্নত হল তখন নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনের ফলে নারীর উপর শিশুপালনের দায়িত্ব এল। নারী শ্রম দেবে বাড়ির ভিতরে আর পুরুষেরা সামলাবে বাড়ির বাইরের কর্ম। ফলে বাড়ির বাইরে পুরুষের বহুগামিতা এক স্বাভাবিক লক্ষণ হয়ে যায়। এরপর থেকেই পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় পুরুষের বহুগামিতার মধ্যে দিয়ে সমাজের চেহারার বদল শুরু হয়। সমাজে নারীরা কোণঠাসা হয়ে যায়। অবশ্য বৈদিক সমাজে নারীরা ছিল মুক্ত চিন্তার অধিকারিণী। সে পুরুষের প্রেরণাদাত্রী কিন্তু বন্দিতা নয়। তারা নিজেরাই নিজের আলোকে উজ্জ্বল। বেদে এমন অনেক নারীকে পাই যারা চিন্তনে, মননে, ব্যক্তিত্বের ঋজুতায় পুরুষের পাশে ভাস্বর। নারীর প্রতি পুরুষের মুগ্ধ আবেগ অর্পিত হয়েছে। নারীরাও একাধিক পতিগ্রহণ করতে পারত, স্বামী পরিত্যাগও করতে পারত। যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করতে পারত।[২]

ধীরে ধীরে নারীর এই আলোকিত অধ্যায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। নারী তার অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলে। নারীকে শূদ্রাণী আখ্যা দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ শুরু হয়ে যায়। নারী সমাজের সর্বনাশের মূল -এই তকমা চালু হয়ে যায়। নারীরা হয়ে পড়ে পর্দানসীন। তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি করা হল। তারা পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তারা অন্তঃপুরের আসবাব, পুরুষের ভোগ্যপণ্য। বিবাহিত নারীরও স্ত্রী হিসেবে কোনো সামাজিক মূল্য ছিল না, শুধু স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যেই তাদের জীবনকে বেঁধে দেওয়া হল। অন্যদিকে কৌলিন্যপ্রথা বাংলাদেশের সমাজকে আরও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ তো এমনিতেই সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করেছিল, এরপর একশ্রেণির ব্রাহ্মণের কুলরক্ষার নামে যথেচ্ছাচার বাংলাদেশকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করে দিল। অবশ্য উনিশ শতকে শিক্ষার প্রভাবে মহিলারা যখন পর্দাপ্রথা ভেঙে বাইরে আসতে শুরু করে তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন।[৩] সুতরাং আধুনিক যুগে যদি ঈশ্বর গুপ্ত মহিলাদের উন্নতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন তাহলে মধ্যযুগে নারীদের অবস্থান যে আরও হীন ছিল তা বোঝাই যায়। ধান ভাণতে শিবের এই গীতের মধ্যে দিয়ে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রেমে ও প্রতিবাদের অবস্থানটিকে দেখতে চাইছি। কারণ সমাজে নারীর এই অবস্থানই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত। নারীর এই শোচনীয় পরিণতির পরপরই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সূচনা।

মধ্যযুগের সমাজে যেখানে নারীর এই ভয়ঙ্কর চিত্র সেখানে প্রেম ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নারীরা যে খুব বেশি অগ্রসর হবে না তা বোঝাই যায়। কারণ নারীর স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সমাজ, সংসার, ন্যায়-নীতি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থাৎ পরিসর ও সমাজগত কারণই নারীর প্রেমে ও প্রতিবাদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বাধা যত প্রবল সেখানে বাধা অতিক্রমের চেষ্টাও ততবেশি। মানবমনের গড়নেই আছে শিকল ভাঙার আর্তি। সুতরাং অন্ধকারের উৎস হতে আলোর মতই মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রেম ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও নারীর পরিসর খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও –

> "প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নর-নারীর সম্পর্ক দাম্পত্য ও পরকীয়া-এই দুই ভাগে মূলত বিন্যস্ত। প্রেম-এই বিষয়টি দাম্পত্য এবং পরকীয়া উভয় ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আর এও দেখেছি দাম্পত্যে প্রেম ক্ষণভঙ্গুর।"[৪]

দাম্পত্য জীবনে সুখী না হওয়ার জন্য নারী অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। এখানে প্রেম অপেক্ষা কামের বেশি প্রকাশ ঘটলেও তা নারীর কাছে এক আলাদা পরিসর হয়েছে। আর মধ্যযুগের সমাজের ঘেরাটোপ অতিক্রম করে নারীর

প্রতিবাদের কোনো আলাদা স্থান না থাকলেও প্রতিবাদ ছিল। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের কবিবর্গ যতই পুরুষ হোক না কেন, তবুও তাঁদের কলমে ফুটে উঠেছে অবরোধবাসিনীর বিদ্রোহিনী সত্তা, তাদের স্বাধীনস্পৃহার শঙ্খধ্বনি।

২

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লোকায়ত প্রেমকাব্য। রাধামুখ্য এই প্রেমকাহিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্যের ধারক। তৎকালীন সমাজ পরিবেশে এই কাব্য অদ্বিতীয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম এই কাব্যের বিষয় হলেও এখানে রাধা চরিত্রের একটি ক্রমিক বিবর্তন আছে।

> "কৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা রক্তমাংসে গঠিতা, প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিতা।" [৫]

মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে কোনো নারী স্বাধীন ছিল না। সতীত্ব সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার বয়স এগারো বটে কিন্তু ওই বয়সেই কি তীব্র ব্যক্তিত্ব কি প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্য! আত্মহারা অবস্থায় সর্বস্ব খোয়াইয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়।[৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা 'তীনভুবনজনমোহিনী', 'রতিরসকামদোহনী', 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী' ও 'অদভুত কনক পুতলী'। সাগর গোয়ালার ঘরে এই রাধার জন্ম। রাধা নপুংসক আইহনের বিবাহিত পত্নী। তার তত্ত্বাবধান করে বড়াই বুড়ি। বড়াইর মুখে রাধার রূপ যৌবনের কথা শুনে কৃষ্ণ মোহিত হয় এবং রাধাকে পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। বড়াইর মাধ্যমে কৃষ্ণ তাম্বুল ও পান পাঠিয়ে রাধাকে প্রেম নিবেদন করলো। অবশ্য একে প্রেম নিবেদন না বলে দেহকামনার প্রস্তাব বলাই ভালো। কিন্তু বড়াইর মারফত কৃষ্ণের দেওয়া এই তাম্বুল ও পান পেয়ে রাধার প্রতিক্রিয়া-

> "এ বোল সুনিআঁ নাগরী রাধা হাতে সকল গাএ।
> যত নানা ফুল পান কর্পূর সব পেলাইল পাএ।।" [৭]

একইসঙ্গে প্রতিবাদের স্বরে জানিয়েছে-

> "ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গেসুন্দর আছে সুলক্ষণ নেহা।
> নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সমে কি মোর নেহা।।
> ... ...
> ধিক জানে নারীর জীবন দহেঁ পসূ তার পতী।
> পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে (হএ) স্থিতী।।" [৮]

এখানে রাধা মধ্যযুগের নারী হয়েও আত্মসচেতন ও আত্মবোধে দীপ্ত চরিত্র।[৯] এদিকে কৃষ্ণের অনুরোধ বড়াই উপেক্ষা করতে পারে না। বড়াই রাধাকে জোর করতে থাকে। কিন্তু রাধা,

> "সরল সুস্থ তেজস্বিনী প্রাণোচ্ছলা। দেহে এবং মনে দুর্বলতা কোথাও নাই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গাঁথিয়া আছে। সংস্কার তাহার চিরকালের সম্পদ। অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ- সে কারণে গর্বও অল্প নয়।" [১০]

সুতরাং এই রাধাকে চিনতে পারা বড়াইর পক্ষে অত সহজ নয়। তাই রাধা গর্জন করে বড়াইকে বলেছে-

> "আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
> আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ।।

এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।।
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলি শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।।" [১১]

তাম্বুলখণ্ডে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৃষ্ণ দানখণ্ডে বৃন্দাবনের অরণ্যে রাধার পথ অবরোধ করেছে। হাটে বিক্রির জন্য রাধা যে দুধ দই নিয়ে যাচ্ছে তার উপর দান চেয়েছে। শুধু পণ্যের উপর দান নয়, কৃষ্ণ রাধার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দান চেয়েছে। কৃষ্ণ জানিয়েছে রাধার জন্য তার হৃদয় উতলা হচ্ছে। একথা শুনে রাধা প্রবল ধিক্কার ও গঞ্জনার সঙ্গে জানিয়েছে-

"যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।।" [১২]

কিন্তু কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। পায়ে ধরে, কংসের ভয় দেখিয়ে, মাতুলানী সম্পর্কের কথা বলেও রাধা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অসহায় রাধা কৃষ্ণকে দেহদান করতে বাধ্য হয়েছে। এই মিলন,

"রাধার কাছে সুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগরণের দিন নয়- বরং একটা ভয়ের দিন, আতঙ্কের দিন, উদ্বেগের দিন, অভিশপ্ত কালো কলঙ্কের দিন।" [১৩]

এই মিলনে রাধার বিরূপতা ও ঘৃণার ভাবই ফুটে উঠেছে-

"ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল প্রত্যেক।
নিজপতি বিহানে আবথা মোর দেখ।।
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে।" [১৪]

যুগ যুগ ধরে সমাজে এইভাবে নারীর উপর বলপ্রয়োগ এবং তার প্রতিরোধস্থাপনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটেই চলেছে। এর থেকে নারীদের মুক্তি নেই। কৃষ্ণ এখানে পুরুষ প্রতাপের যাবতীয় কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে রাধাকে তার কাঙ্খিত পরিতৃপ্তির যন্ত্র করে তুলে আসলে রাধার প্রাথমিক প্রতিরোধী ভূমিকাকেই যেন শায়েস্তা করতে চাইছেন।[১৫]

নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ কাণ্ডারী সেজে অন্যান্য গোপীদের নদী পার করে দিলেও রাধাকে আলাদাভাবে পার করে দেওয়ার সময় আবার রাধার দেহকামনা করে। রাধা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও মাঝনদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলিত হল। তাম্বুলখণ্ডে যে রাধার দেহকামনা বা প্রেমার্তি যাই বলি না কেন, তার উন্মেষ না ঘটলেও দানখণ্ডে জোর করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েও- যে মিলনে বিন্দুমাত্র হৃদয় সম্পর্ক ছিল না- আমরা দেখি সেই রাধার মধ্যে যৌনতার আনন্দ এসেছে। তাই নৌকাখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় তার শরীর কিন্তু রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় থাকেনি।[১৬] রাধাকৃষ্ণের মিলনের বর্ণনাটি লক্ষ করলেই একথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে-

"নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কৈল নখঘাত।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চসাত।।
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন।।

> … … …
> রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
> চমকি করিল রাধা আতি রতি সুখে।।" [১৭]

রাধার এই শরীর চেতনা তাকে সচেতন করে তুলেছে। তাই বড়াইর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাধা কৌশলে তার এই মিলনের কথা গোপন করে জানালো-

> "আচম্বিতে খরতর বাহিলেক বাঅ।
> মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ।।
> ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
> আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে।।
> এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
> জরসেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুণ তাহার।।" [১৮]

রাধার মধ্যে আগের মত আর ভয় ও সংকোচ নেই। সে নিজের সত্তা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাধা কৃষ্ণের তারিফ করতেও ছাড়লো না। হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হলে লজ্জার বাতাবরণ তৈরি হয়। তখন লজ্জা ও ছলনার মধ্যে দিয়ে আত্মগোপন করতে হয়। কাব্যের প্রথমে রাধার মধ্যে যে দৃঢ়তা, কাঠিন্য, আত্মমর্যাদার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ করি, তা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

> "কৃষ্ণ এই কাঞ্চনপ্রতিমাকে ভাঙতে পারেননি, তাঁর তীব্র কামনার উত্তাপে স্বর্ণময়ী রাধার কায়াকান্তি বিগলিত হয়ে জন্ম নিয়েছে আর এক নারী।" [১৯]

এই নারী আর কেউ নয়, প্রেমিকা রাধা।

> "ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যাহাকে দেহদান করিতে হইল তাহার বিরুদ্ধে হয় প্রেম, নয় ঘৃণা কোনো একটি জাগিবে। রাধিকার প্রেমই জাগিয়াছিল। দেহের সোপান বাহিয়া সেই প্রেমের পদক্ষেপ।" [২০]

কাব্যের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রাধার প্রেমপূর্ণ চিত্রেরই প্রকাশ দেখি। ভারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে দিয়ে দুধ দইয়ের ভার বহন করিয়েছে, ছত্র খণ্ডে দেহদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছত্র ধারণ করিয়েছে, কৃষ্ণের মজুরি নিয়ে রসিকতা করে শেষপর্যন্ত দেহদানের কথা রাখেনি। দুজনে কথা-কাটাকাটির মধ্যে দিয়ে আরো নিকটতর হয়েছে। বৃন্দাবনখণ্ডে দেখি কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকদিন রাধার সাক্ষাৎ হয়নি। রাধা কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে পড়ে। রাধা নিজেই বড়াইর মারফত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথ তৈরি করেছে। রাধার বিরহের কথা শুনে কৃষ্ণ পুষ্পবনে উপস্থিত হয়েছে। কৌতুকে-কটাক্ষে রাধা নিজেকে কৃষ্ণের কাছে মেলে ধরতে চেয়েছে-

> "বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
> আর নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁ পাশে।।
> খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তল ভার।
> সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার।।
> চুম্বন করিল রাধা সখীর বদনে।
> ভালগীত গাএ বুলী পড়িল মদনে।।" [২১]

রাধার এই আগমনকে অভিসার বলা যেতে পারে।[২২] এদিকে কৃষ্ণ অন্য গোপীদের সঙ্গে বিলাস করে রাধার কাছে উপস্থিত হয়েছে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর। রাধা মানিনী হয়েছে। প্রেমে অধিকারবোধ জন্মালে মান-অভিমান জাগবেই। রাধারও তাই হয়েছে। কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙাতে তার সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলন রাধা তৃপ্তির সাথে উপভোগ করেছে-

"পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন কৈল মনমথ পরিতোষে।
দুইহো মনের উল্লাসে করিল বিলাসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।।" [২৩]

কালীয়দমনখণ্ডে দেখি কৃষ্ণ কালীয় নাগের দংশনে অচেতন হয়েছে। গোপযুবতী, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে রাধাও সেখানে উপস্থিত হয়েছে। স্বামী, ধর্ম, লজ্জা, ভয় সবকিছু দূরে সরিয়ে রাধার কৃষ্ণার্তি প্রকাশ পেয়েছে-

"কি করিব ধনজনে জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে।।" [২৪]

যে প্রেম সমাজের চোখে অবৈধ, সেই প্রেমের জন্য রাধার এই অনাবৃত উৎকণ্ঠা সমাজের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহিনী সত্তারই প্রকাশ ঘটেছে।

পরবর্তী হার ও বাণখণ্ডে দেখব কৃষ্ণ রাধাকে সম্মোহন বাণ মেরেছে হার চুরির জন্য। এই সম্মোহন বাণের প্রভাবে রাধার মধ্যে তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখি। রাধার স্বামী, শাশুড়ি কঠোর স্বভাবের। সখিরাও কৃষ্ণের কারণে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। কিন্তু রাধার এখন সব বাধা ঘুচে গেছে। যে রাধা তীব্রকণ্ঠে কৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়েছিল, সেই রাধার এখন হৃদয়বাসনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে-

"এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি স জাইবোঁ ঘর।
এথাঞিঁ আনায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর।।
এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার।।" [২৫]

রাধার কাছে এখন প্রেমই মুখ্য। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধা আকুল হয়ে পড়ে। সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। রাধার প্রেম আর সীমা মানে না। তার ইচ্ছা করছে-

"পাখি নহোঁ তার ঠাই ঊড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।" [২৬]

এই বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেতে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে- যাতে বাঁশি ফিরে পেতে কৃষ্ণ তার কাছে ধরা দেয়। কিন্তু কৃষ্ণ আর ধরা দেয়নি। কংস বধ করার জন্য কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করেছে। শুরু হয়েছে বিরহিনী রাধার বিলাপ-

"মো কেহ্নে জানিবো হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিনি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ।।" [২৭]

রাধার কাছে এখন সবকিছু শূন্য মনে হয়, জীবন-যৌবন অসার মনে হয়। রাধা তার এই প্রেমের স্বীকৃতি পায়নি অথচ সমাজ সংসার থেকেও তার অবস্থান বিচ্যুত হয়েছে।

> "রাধা চরিত্রে আমরা প্রতিফলিত দেখেছি এই সমাজেরই নারী ভাগ্যের সামগ্রিক প্রতিবিম্ব। অনিচ্ছুক বা ইচ্ছুক রাধার উভয় প্রান্তই এই সমাজে নারী ভাগ্যের সীমানা। কৃষ্ণের হাতে আত্মসমর্পণের অনিচ্ছা প্রকাশে তার বিদ্রোহ, আবার আত্মনিবেদনে ইচ্ছুক রাধাও সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তার বিদ্রোহ সফল নয়। সে সামন্ত-শাসিত বাঙালি সমাজের প্রথম নতজানু বিদ্রোহিনী।।" [২৮]

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, যুগ বিবর্ত্তনে নারীত্বের অবমূল্যায়ন, আনন্দময়ী প্রকাশনী, গুড়াপ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৫
২. চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী: নারী মনস্তত্ত্বের অসামান্য রূপকৃতি, বিশ্বনাথ রায় (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ৩১৮
৩. মুরশিদ, গোলাম, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৯
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৮, পৃ. ১৫
৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪১
৬. তদেব, পৃ. ৪৫
৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দে'জ পাবলিশিং, ষোড়শ সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃ. ২১১
৮. তদেব, পৃ. ২১১
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১০. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
১১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
১২. তদেব, পৃ. ২২৯
১৩. মজুমদার, জহর সেন, মধ্যযুগের কাব্য : স্বর ও সংকট, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৬
১৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
১৫. মজুমদার, জহর সেন, মধ্যযুগের কাব্য : স্বর ও সংকট, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
১৬. দাস, অপু, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ, বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ২০৭
১৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৯৭
১৯. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১১
২০. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
২১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫
২২. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, বইমেলা,

২০১১, পৃ. ৬২

২৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭

২৪. তদেব, পৃ. ৩৩৯

২৫. তদেব, পৃ. ৩৭০

২৬. তদেব, পৃ. ৩৮০

২৭. তদেব, পৃ. ৪৪২

২৮. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২